



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1033 - 1042

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধ সাহিত্য : ধর্ম ভাবনার আলোকে

নয়ন দে

গবেষক, বাংলা বিভাগ

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

Email ID: deynayan.8551@gmail.com

 0009-0005-7706-8403

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Syed Mujtaba Ali, Bengali essay literature, Religion, God, Humanism, Rationalism, Religious bigotry, Social criticism.

Abstract

Syed Mujtaba Ali (1904-1974) holds a unique place in the history of Bengali essays. His writings reflect humor, wit, satire, social awareness, and deep human values as well as a strong religious sense. A passionate traveler, Mujtaba Ali gathered a wide range of life experiences through his education and work in several countries like India, Afghanistan, Germany, and Egypt. These experiences shape his thinking from an international perspective. As a result, his writings reflect a broad and open understanding of religion rather than a narrow and superstitious outlook.

A key feature of Mujtaba Ali's religious thought is his rational approach. He never accepted any religion blindly; instead, he examined religious ideas from a rational viewpoint. His writing style is lively and rich in literary charm, which makes even difficult religious and philosophical discussions easy for readers to understand. His essays revealed that he was not only a writer, but also a philosopher, a social thinker, and above all, a humanist.

Mujtaba Ali's ideas or thoughts about religion are not merely the expression of religious knowledge, rather his thoughts are closely connected with social justice, human values, and universal humanity. In his essays, he uses humor and satire to criticize narrow-minded attitudes in society, while at the same time explaining the true spirit of religion from a humanistic point of view.

Therefore, it may be argued that Syed Mujtaba Ali's essays offer not merely literary pleasure but, also profound intellectual insight grounded in religious and humanistic perspectives. His position in Bengali essays is, thus, distinctly unique. This study establishes that Mujtaba Ali's essays on religion embody not only spiritual concerns but also a creative synthesis of rationale, humanistic values, and universalism.

Religious narrowness has no place in Mujtaba Ali's essays. He took the lesson of equality from the core teachings of Hinduism, Islam, Buddhism,

and Christianity. According to him, the main purpose of religion should be human welfare, brotherhood, and mutual respect. In the essay 'Barlaam and Yosaphat' he highlights the inter-connection between Christianity and Buddhism and shows that a common confluence of humanity runs through all religious texts. In the essay 'Panda' his humanist view of religion is clearly revealed in his strong protest against hypocrisy and deceit prevalent in the name of religion.

Discussion

ভূমিকা : বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মূল্যবান রচনার পাশাপাশি রমেশচন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। বিংশ শতাব্দীতে এসে প্রবন্ধের আঙ্গিক বহুমাত্রিক রূপ লাভ করে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে বিশ শতক একটি উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যময় অধ্যায়। এই সময়ে প্রবন্ধ কেবল সাহিত্যিক রচনার এক ঘরানা হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এটি হয়ে উঠেছিল সমাজ-রাজনীতি, সংস্কৃতি, ভাষা ও ভ্রমণ অভিজ্ঞতার প্রকাশমাধ্যম। এই প্রেক্ষাপটে সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে নতুন মাত্রা এনেছিলেন। এই সময়ে সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪) বাংলা প্রবন্ধকে নতুন ভাষা রীতি, হাস্যরসাত্মক ভঙ্গি ও সমকালীন সমাজ সচেতনতার আলোয় সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রবন্ধে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার প্রতিফলিত হয়েছে, অন্যদিকে সমকালীন সমাজ-রাজনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর সক্রিয় সংযোগও স্পষ্ট হয়েছে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধ সাহিত্য : একটি প্রেক্ষাপট— অভিধান বা সাহিত্যের সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রবন্ধ সাহিত্যকে সাধারণত গম্ভীর ও শিক্ষণীয় রচনা হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু সৈয়দ মুজতবা আলী সেই অর্থে কখনও প্রবন্ধ লেখেননি। তাঁর লেখাগুলি মূলত রম্যরচনা হিসেবে পরিচিত হলেও বিস্তৃত অর্থে এগুলি প্রবন্ধই। প্রবন্ধের ভাষা সাধারণত যতটা সম্ভব সহজ-সরল, স্বচ্ছ-সাবলীল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে রচিত হয়। প্রবন্ধের ভাষার ক্ষেত্রে হালকা রসিকতা, সূক্ষ্ম পরিহাস বা ব্যঙ্গের ছোঁয়া দেখা যায়। প্রবন্ধের বিষয়ের তুলনায় ভাষাগত বৈশিষ্ট্যই প্রবন্ধকে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য ও উপভোগ্য করে তোলে। তাঁর প্রবন্ধ পাঠে আমরা অনুভব করি, গুরুগম্ভীর কোন উপদেশ তিনি দেননি, বরং আপন ভঙ্গিতে পাঠকের পাশে বসে গল্প করেছেন, হাসিয়েছেন ও নিজেও হেসেছেন। মনে হয় যেন একসঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে আমরা নতুন কিছু জেনে নিচ্ছি। শেষ পর্যন্ত বোঝা যায় যে, তাঁর অসীম পাঠাভ্যাস ও জীবনানুভব আমাদেরও হয়ে উঠেছে। এখানেই রয়েছে লেখকের বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও বিচার বিশ্লেষণ, যা যুক্তি ও বুদ্ধির প্রার্থ্যে ও প্রবন্ধকারের হৃদয়ানুভূতির স্নিগ্ধ দ্যুতিতে দীপ্যমান। তাঁর প্রবন্ধ সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক, -

“আলী সাহেব বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে অসংখ্য ছোট ছোট লেখা লিখেছেন, সেগুলির সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে রম্যরচনা। আমার মতে, এই নামটি খুবই ভুল। তিনি যা লিখেছেন, সেগুলি আসলে প্রবন্ধ। যেহেতু সেগুলি আমাদের পড়তে ভালো লাগে, কিংবা মজা পাই, কখনও একলা একলা হেসে উঠি, তাই কি ওগুলো প্রবন্ধ হতে পারবে না?”

সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধ পড়া মানে এক আনন্দময় সহযাত্রা, যেখানে সচেতন চেষ্টা না করেও নানা জ্ঞান আহরণ করা যায়। তাঁর রচনায় যে বিস্তৃত পাণ্ডিত্য রয়েছে, তা পাঠক টের পান, কিন্তু তিনি কখনও তা প্রদর্শন করেন না। ফলে পাঠকের মনে আড্ডার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দই তৈরি হয়, অহমিকা নয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, তিনি তাঁর প্রবন্ধ রচনায় নিজের সম্পর্কেই সবচেয়ে বেশি রসিকতা করেছেন, আর তাতেই তাঁর মনীষার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ।

বাংলা সাহিত্যে সাধারণত দেখা যায়, একজন লেখক বিশেষ কোনো শাখায় সাফল্য অর্জন করেন এবং সেই শাখায়ই তাঁর খ্যাতি গড়ে ওঠে। কিন্তু সৈয়দ মুজতবা আলীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি একাধারে প্রাবন্ধিক, ভ্রমণকাহিনিকার, কথাসিদ্ধি, এমনকি কবিও ছিলেন। তাঁর ভাষা ছিল কৌতুকরস, ব্যঙ্গ, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও আন্তরিক আবেগে

ভরপুর। ফলে তাঁর লেখাগুলি শুধু তথ্যসমৃদ্ধ নয়, বরং পাঠককে এক ধরনের আনন্দ ও নতুন চিন্তার জগতে নিয়ে যায়। এই বহুমুখী প্রতিভা ও ভিন্নতর শৈলীর কারণে সৈয়দ মুজতবা আলীকে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সাহিত্যপুরুষ বলা যায়। তাঁর লেখায় যেমন বিশ্বদর্শন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির বিশ্লেষণ। তাই তিনি শুধু একজন সাহিত্যিক নন, বরং এক বিশ্বমানব, যিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনন্য অবদান রেখে গেছেন।

সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন ভ্রমণপিপাসু, বহু ভাষাবিদ এবং অসাধারণ জীবন-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক সাহিত্যিক। তিনি জার্মানি, আফগানিস্তান, মিশর, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, ভারতসহ বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। এই বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা তাঁর প্রবন্ধে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শৈশব থেকেই তিনি বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন। কলকাতায় পড়াশোনা শেষে তিনি জার্মানির বিশ্ববিখ্যাত ভিসবাদেন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। আফগানিস্তানে শিক্ষকতা, মিশর, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সে অবস্থান— সব মিলিয়ে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল একেবারেই বৈচিত্র্যময়। এই বিশ্বদর্শন তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে বহুভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর রচনায় যেমন স্থানীয় বাঙালি জীবনের অভ্যন্তরীণ ছবি আছে, তেমনি আছে আফগানিস্তান বা ইউরোপের অভিজ্ঞতাও। ফলে তাঁর প্রবন্ধকে বলা যায় এক ‘গ্লোবাল অথচ লোকাল’ অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন। সমালোচকের মতে, -

“এক সময় ঠাট্টা করে বলা হতো, যে লেখা পড়লে কিছুই মানে বোঝা যায় না, তারই নাম আধুনিক কবিতা। সেই রকমই, এক সময় এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, যখন যে লেখা পড়তে ইচ্ছেই করে না তারই নাম ছিল প্রবন্ধ। সৈয়দ মুজতবা আলীই প্রবন্ধকে সেই অকাল মৃত্যুদশা থেকে বাঁচিয়েছেন। তিনি অন্তত একশোটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে, অন্তত সাতটি ভাষা সৈঁচে যে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন, তা-ই বিতরণ করেছেন তাঁর রচনায়। এগুলি প্রবন্ধ ছাড়া আর কি?”^২

মুজতবা আলীর প্রবন্ধগুলিকে বিচার করতে গেলে দেখা যায়— ‘পঞ্চতন্ত্র’ থেকে শুরু করে ‘ময়ূরকণ্ঠী’ ও ‘ধূপছায়া’ প্রভৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে নানা লেখা। এসব প্রবন্ধে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে চরিতকথা, রাষ্ট্রভাষা ও মাতৃভাষার প্রশ্ন, মানবতাবোধ, ধর্মতত্ত্ব, মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধার্থ্য এবং বিশেষত রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে গুরুদেবের মাহাত্ম্য প্রচার।

তিনি শুধু প্রাবন্ধিক নন, ভ্রমণসাহিত্যিক, গল্পকার ও অনুবাদক হিসেবেও প্রসিদ্ধ। তবে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটে প্রবন্ধ রচনায়। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে বিষয়ের বৈচিত্র্যময়তা আমরা খুঁজে পাই। সেগুলো নিম্নরূপ; -

- ভ্রমণপিপাসু মননে রচিত মুজতবা আলীর ভ্রমণমূলক প্রবন্ধ।
- ধর্মচিন্তার আলোকপ্রভায় দীপ্যমান তাঁর প্রবন্ধসাহিত্য।
- ভাষাচেতনায় দীপ্ত মুজতবা আলীর ভাষাবিশয়ক প্রবন্ধ।
- সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চায় মুজতবা আলীর প্রবন্ধ।
- মুজতবা আলীর প্রবন্ধভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- মুজতবা আলীর প্রবন্ধে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের মনীষা ও তাঁদের চিন্তা-দর্শন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনায় ধর্মচিন্তা— এই গবেষণাপত্রে আমরা সৈয়দ মুজতবা আলীর ধর্ম ভাবনা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। সর্বমোট এগারো খণ্ডে প্রকাশিত সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনাবলী (‘মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স’) থেকে ধর্ম-ভাবনা ও ধার্মিক মনীষা-মনীষী বিষয়ক প্রবন্ধের একটি সারণি নিম্নে তুলে ধরেছি।

তাঁর ধর্ম ভাবনা বিষয়ক প্রবন্ধের তালিকা -

রচনাবলি সংখ্যা	গ্রন্থনাম	প্রবন্ধের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
রচনাবলি ০১	পঞ্চতন্ত্র (১ম পর্ব)	১। ভক্তি	৪১-৪৪
	ময়ূরকণ্ঠী	২। পাণ্ডা	১৪৩-১৪৫
		৩। গীতা রহস্য	১৪৫-১৪৬

রচনাবলি ০২	ধূপছায়া	৪। লেসে ফ্যোর	৪০-৪৩
		৫। বুদ্ধ শরণং	৭২-৭৫
	পঞ্চতন্ত্র (২য় পর্ব)	৬। মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা পণ্ডিতের নিদ্রা শ্রেয়ঃ	১৩৯-১৪৪
		৭। বার্লাম ও যোসাফট	২১০-২১৩
	চতুরঙ্গ	৮। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব	২৫০-২৬১
রচনাবলি ৩	টুনি মেম	৯। ধর্ম	১৬১-১৬৩
		১০। ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা	১৬৩-১৬৬
		১১। ধর্ম ও কম্যুনিজম	১৬৬-১৬৯
রচনাবলি ০৪	বড়বাবু	১২। অল-মসজিদ-উল-আকসা	২৩৩-২৩৫
রচনাবলি ০৭	ভবঘুরে ও অন্যান্য	১৩। খৃষ্ট	৮৯-৯১
		১৪। বাঙলা দেশ	১৩৪-১৩৯
		১৫। বাঙলা দেশ	১৫২-১৫৪
রচনাবলি ০৭	সত্যপীরের কলমে	১৬। ৫৭০-১৯৭০/১৪০০ হজরৎ মুহম্মদ (দ)-এর চতুর্দশ জন্মশতবার্ষিকী	২১০-২১২
		১৭। ভাই ভাই ঠাই	২১২-২১৮
		১৮। ভাই ভাই ঠাই না ভাই ভাই এক ঠাই	২১৯-২১২
		১৯। ভাই ভাই এক ঠাই	২২১-২২৯
রচনাবলি ০৯	বিবিধ	২০। ধর্ম শরণং?	২৯৯-৩০২
রচনাবলি ১০	অপ্রকাশিত রচনা	২১। রাষ্ট্র ধর্ম ও সমাজ	২১৬-২১৯
রচনাবলি ১১	বিচিত্রা	২২। হজরৎ সৈয়দ নিজাম উদ্দীন চিশতী	৪০-৪৪

উক্ত রচনাবলি সমূহের বিভিন্ন প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রবন্ধ রচনা সমূহকে ধর্মতত্ত্বমূলক প্রবন্ধের পর্যায়ে আমরা ফেলতে পারি, এই সব রচনায় অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলভাবে লেখকের যে মূলভাবের প্রকাশ ঘটেছে তা হল সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা, অর্থাৎ উক্ত বিষয়সমূহ আলোচনার শেষে প্রত্যেকবারই তিনি প্রমাণ করেছেন যে সর্ব ধর্মের শেষ বক্তব্যই হল ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ধর্মকে কেবল আচার বা আস্থার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ করেননি, বরং সংস্কৃতি ও ইতিহাসের আলোকে বিচার করেছেন। ধর্মীয় ভেদাভেদের পরিবর্তে তিনি মানুষে মানুষে সংযোগ, শ্রদ্ধা ও মৈত্রীর উপর জোর দিয়েছেন। আমরা জানি তুলনামূলক ‘ধর্মতত্ত্ব’ মুজতবা আলীর অন্যতম বিচরণ ক্ষেত্র, এই বিষয়ে তিনি গভীর পড়াশোনা ও অধ্যয়ন করেছেন, আলোচনা করেছেন মুক্ত মন নিয়ে, দেখেছেন মুক্ত দৃষ্টিতে।

‘পঞ্চতন্ত্র’ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘ভক্তি’ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হল - ভক্তি ও প্রেমের মাধ্যমে সেই অদৃশ্য ও অনির্বচনীয় সত্তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা। তিনি মনে করেন যে, যীশু খৃষ্ট এসে এই ভাবধারা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন। কারণ খৃষ্ট ধর্ম প্রচারে বলা হয়েছে, -

“তিনি বললেন, সৃষ্টিকর্তা রাজাধিরাজ, তাঁর ঐশ্বর্যের সীমা নেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তিনি আমাদের পিতা। এইখানেই ভক্তির সূত্রপাত। ভগবানকে ভয় করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর করুণা, তাঁর ম্লেহ পেতে হলে তাঁকে ভালবাসতে হবে পিতার মত।”^৩

সৈয়দ মুজতবা আলীর মতে, ভগবানকে পাওয়া যায় কেবল ভালোবাসার দ্বারা, আর সেই ভালোবাসা যখন গভীরতম রূপ নেয়, তখন ভগবানকে কেবল পিতা বা মাতারূপে নয়, বরং হৃদয়ে স্থান দিতে হয় প্রিয়তম বা প্রেমিক রূপে। তিনি এই

মত প্রকাশ করতে গিয়ে কোনও নির্দিষ্ট ধর্মকে প্রাধান্য দেননি; বরং বিভিন্ন ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে শেষ পর্যন্ত নিজের অভিমত জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যে বিশেষভাবে খৃষ্ট ধর্ম (ক্যাথলিক) ও বৈষ্ণব দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘পাণ্ডা’ প্রবন্ধ তাঁর অন্যতম ব্যঙ্গসাত্ত্বিক অথচ বাস্তবভিত্তিক রচনা, যেখানে ধর্মের নামে ধর্মস্থানেই গড়ে উঠেছে ভগ্নাঙ্গ, প্রতারণা ও অর্থলোভ, তারই কড়া সমালোচনা করেছেন তিনি। তিনি বলেছেন, -

“শুধু এইটুকু বলে রাখি, পাণ্ডা বলতে ভারতীয় যে মহান জাতের কথা ওঠে তার কোনো জাত নেই। অর্থাৎ শ্রীধামের পাণ্ডা আর আজমীরের মুসলমান পাণ্ডাতে কোনো পার্থক্য নেই-যাত্রীর প্রাণটা নিমেষে কর্তাগত করবার জন্য এঁদের বজ্রমুষ্টি ভারতের সর্বত্রই এক প্রকার। ভারতের হিন্দু-মুসলমান মিলনের এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হতে পারে?”^৪

‘পাণ্ডা’ প্রবন্ধে আমরা তাঁর তীর্থস্থান ভ্রমণ পিপাসু মনের পরিচয় পাই। তিনি যখন বলেন, -

“আমি তীর্থপ্রাণ। অর্থাৎ তীর্থ দেখলেই ফুল চড়াই, ‘শীরণী’ বিলাই। ভারতীয় তাবৎ তীর্থ যখন নিতান্তই শেষ হয়ে গেল তখন গেলুম জেরুজালেম। ইহুদি, খ্রীষ্টান, মুসলমান এই তিন ধর্মের ত্রিবেণী জেরুজালেমে। বিশ্বপাণ্ডার ইউ.এন.ও এখানেই। সেখান থেকে গেলুম বেৎলেহেম-প্রভু যীশুর জন্মস্থান।”^৫

তিনি ভেবেছিলেন, যীশুর জন্মভূমি এবং জন্মস্থান বাইবেলের বর্ণনার মতো, সাধারণ ভাঙাচোরা সরাই ও জরাজীর্ণ আস্তাবলে দেখতে পাবেন। কিন্তু সেখানে পেলেন বিশাল গির্জা। গির্জার সৌন্দর্য ও ভেতরের মোজাইক শিল্প তাঁকে মুগ্ধ করলেও, ভূগর্ভস্থ আস্তাবল দেখতে গিয়ে এক প্রহরীর (পাণ্ডা-সদৃশ ব্যক্তি) মুখোমুখি হন, যিনি প্রবেশের জন্য অর্থ দাবি করেন। লেখক বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন তোলেন, -

“আমি ভারতীয়, খ্রীষ্টান নই, তবু সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী পেরিয়ে এসেছি সেই মহাপুরুষের জন্মভূমি দেখতে যিনি সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছিলেন গরিব-ধনীর তফাত-ফারাক ঘুচিয়ে দেবার জন্য, যিনি বলেছিলেন কেউ কামিজটা চাইলে তাকে জোকাটি দিয়ে দেবে-আর তাঁর জন্মভূমি দেখবার জন্য দিতে হবে পয়সা?”^৬

যীশু যিনি ধনী-গরিব ভেদ ঘোচাতে চেয়েছিলেন, তাঁর জন্মভূমি দেখতেও যদি টাকার প্রয়োজন হয় তবে তা এক বিরাট বৈপরীত্য। এই অভিজ্ঞতায় তিনি হতাশ হয়ে ফিরে আসেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘গীতা রহস্য’ প্রবন্ধে মূলত তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গুরুত্ব, দর্শন ও মানবিক তাৎপর্য নিয়ে তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধে তিনি গীতাকে কেবল একটি ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নয়, বরং জীবন-দর্শনের এক সর্বজনীন গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করেছেন, -

“গীতার মত ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীতে বিরল। তার প্রধান কারণ, গীতা সর্বযুগের সর্ব মানুষকে সব সময়েই কিছু না কিছু দিতে পারে। অধ্যাত্মলোকে চরম সম্পদ পেতে হলে গীতাই অত্যন্ত পথপ্রদর্শক, আর ঠিক তেমনি ইহলোকের পরম সম্পদ পেতে হলে গীতা যেরকম প্রয়োজনীয় চরিত্র গড়ে দিতে পারে, অন্য কম গ্রন্থেরই সে শক্তি আছে। ঘোর নাস্তিকও গীতাপাঠে উপকৃত হয়। অতি সবিনয়ে নিবেদন করছি, এ কথাগুলো আমি গতানুগতিকভাবে বলছি নে, দেশ-বিদেশে গীতাভক্তদের সাথে একসঙ্গে বসবাস করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করেছে।”^৭

সৈয়দ মুজতবা আলীর ধূপছায়া সংকলনের ‘লেসে ফের’ প্রবন্ধে তিনি ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যকলাপের সমালোচনা করেছেন। আসামে খ্রিস্টান মিশনারিদের উপস্থিতি নিয়ে এক সূক্ষ্ম সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। উক্ত প্রবন্ধে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, মিশনারিদের পাহাড়ি অনুন্নত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নির্মিত বাংলা, বাগান, সাজসজ্জা ও জীবনযাত্রা প্রথম দর্শনে আকর্ষণীয় ছিল, কিন্তু এর অন্তরালে ছিল ভয়ঙ্কর মানসিক ক্ষতি। কারণ, পাহাড়ি অনুন্নত জাতিগোষ্ঠী - যেমন নাগা বা লুসাই-এই বিলাসী জীবন দেখে মনে করত, খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলে তারাও হয়তো ওই জীবন লাভ করবে। অথচ বাস্তবে তাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতায় সেই স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং-এ পৌঁছানো কখনও সম্ভব ছিল না। ফলস্বরূপ, তারা হীনমন্যতা, অস্থিরতা ও দ্বন্দ্ব ভুগতে থাকে। মুজতবা

আলীর মতে, এটাই ছিল মিশনারিদের সর্বনাশ - তাঁরা ধর্মের সঙ্গে এমন এক জীবনযাত্রার প্রলোভন জুড়ে দিয়েছিল, যা অনুন্নত জাতিগোষ্ঠীর কাছে চিরকাল অপ্রাপ্য থেকে গিয়ে তাদের সহজ-সরল জীবনকে বিষময় করে তুলেছিল।

“অনুন্নত জাতি বুঝতে পারে না যে, খ্রীস্টান হয়ে গেলেই সে পাদরী সায়েবের বাংলা ভেট পেয়ে যাবে না। পাদরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে পাদরীর বাড়ি-ঘর-দোর, জামা-কাপড়, বাসন-কোসন, টেবিল-চেয়ার দেখে মুগ্ধ হয় এবং এই সব জিনিস যোগাড় করার জন্য তার সরল মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু নাগা কিংবা লুসাইয়ের যা আমদানি, তা দিয়ে এসব বস্তুর কল্পনাও সে করতে পারে না। ফলে তার জীবন বিষময় হয়ে ওঠে।

পাদরী সায়েবরা এই সর্বনাশটি করেছেন অনুন্নত জাতিদের। চোখের সামনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে ছিমছাম স্টান্ডার্ড অব লিভিংটি তুলে ধরেছেন, সে-স্টান্ডার্ডে পৌঁছানোর ক্ষমতা নাগা কিংবা লুসাইয়ের কস্মিনকালেও হবে না - দ্বন্দ্ব তার লেগেই থাকবে”^৮

এতে শুধু ধর্মীয় নয়, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ক্ষতিও ঘটেছে। ধর্মান্তরকে যেন একটা উন্নতির সিঁড়ি হিসেবে দেখানো হয়েছে, ফলে সাধারণ মানুষ নানা বিভ্রান্তির মুখোমুখি হয়েছিল। যার ফলে স্থানীয় সমাজে বিভাজনের সাথে তাদের স্বকীয় ধর্ম-সংস্কৃতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর ধূপছায়া রচনা সংকলনের ‘বুদ্ধ শরণং’ প্রবন্ধে ধর্ম পরিবর্তনের প্রশ্নটি তিনি গভীরভাবে আলোচনায় এনেছেন। তাঁর মতে, মানুষের আত্মিক উন্নতি কিংবা মুক্তির জন্য ধর্ম পরিবর্তন একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। কারণ তিনি স্পষ্টভাবেই বলেন যে, আধুনিক যুগে ধর্ম পরিবর্তনের আর কোনও প্রয়োজন নেই। একসময় ভিন্ন ধর্মের দর্শন বা শিক্ষা লাভ করতে হলে মানুষকে সেই ধর্মে দীক্ষিত হতে হত, কারণ প্রত্যেক ধর্ম ছিল নিজস্ব সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। ফলে বাইরে থেকে কেউ তার সার গ্রহণ করতে পারত না। কিন্তু আজকের যুগে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমত, সব ধর্মগ্রন্থ এখন সহজলভ্য; যে কেউ অন্য ধর্মের মূল দর্শন সম্পর্কে পড়াশোনা করতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাধু-সন্ত, চিন্তক ও নৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে মানুষের সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব, ফলে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভিন্ন সমাজের ভালো-মন্দ বিচার করা যায়। তৃতীয়ত, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ায় মানুষ স্বাধীনভাবে অন্য ধর্মের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ভিন্ন ধর্মের দর্শন বা শিক্ষা লাভ করতে নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

“আমার মনে হয়, ধর্ম পরিবর্তনের যুগ আর নেই, প্রয়োজনও নেই। একদা এ-পৃথিবীতে অন্য ধর্মের তত্ত্ব এবং সার অনুসন্ধান করতে হলে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ এবং সে-সমাজে সম্পূর্ণ প্রবেশ না করে সে-ধর্মের ফল লাভ করার কোন পন্থা উন্মুক্ত থাকত না-কারণ তখন প্রত্যেক ধর্ম আপন আপন সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকত। আজ সব ধর্মগ্রন্থ অনায়াসলভ্য, আজ আমরা অন্য ধর্মের সাধুসজ্জনদের সহবাস করতে পারি, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের দোষগুণ আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে নিতে পারি। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য, এ-কর্ম সহজ, সরল করে দেওয়াও বটে। সুতরাং আজ আর ধর্ম পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই; আজ হিন্দু খ্রিস্টান না হয়েও আপন সমাজে অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে পারে, মুসলমান হিন্দু না হয়েও শঙ্করদর্শন মেনে নিয়ে জীবন সে ধারায় চালাতে পারে।”^৯

তিনি বৌদ্ধধর্মের শান্তিবাদী চরিত্র ও তার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। মুজতবা আলীর মতে, বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। এর পেছনে অবশ্যই তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব ছিল। ফলস্বরূপ মৌর্য যুগে ভারতবর্ষ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি অখণ্ড রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি আরও বলেন, সারিপুত্র, মহামৌদগল্যায়ন প্রমুখ বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যদি মৃত্যুকে তুচ্ছ জেনে দেশ-দেশান্তরে শান্তির বাণী প্রচার না করতেন, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সীমারেখা মুছে যেত না। সেই নিরলস প্রচেষ্টাই প্রদেশগুলোকে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে বেঁধে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ গড়ে তোলে। অতএব, মুজতবা আলীর দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ নয়, বরং রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যেরও প্রধান চালিকাশক্তি। শান্তির বাণী প্রচারই ছিল সেই ঐক্যের মূল চাবিকাঠি।

সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘বার্লাম ও যোসাফট’ প্রবন্ধ থেকেই আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, বহিঃবিশ্বের নানা ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্যের উপর ছিল তাঁর গভীর ও অবোধ জ্ঞান। ‘বার্লাম ও যোসাফট’ মধ্যযুগীয় ধর্মকাহিনিধর্মী এক গ্রন্থ, যার বিষয়বস্তু মূলত এক রাজপুত্রের জ্ঞানপ্রাপ্তি ও ধর্মগ্রহণের কাহিনি। এর মূল উৎস আসলে বৌদ্ধধর্মীয় কাহিনি, যা গ্রিক, সিরিয়াক, আরবি প্রভৃতি ভাষা হয়ে পরে ইউরোপীয় সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়। এই গ্রন্থ সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলীর মন্তব্য হল, -

“ইয়োরাপীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের চার-পাঁচটি ভাষা নিয়ে প্রায় ষাটটি ভাষায় অনূদিত ‘বার্লাম ও যোসাফট’ ইয়োরাপে ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়া থেকে খ্রিস্টান মঠে তথা সাধুসন্ত ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হয়ে ক্রমে ক্রমে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়ায়। তার প্রধান কারণ, অতি সুমধুর সরল গল্পছলে এই পুস্তকে বর্ণিত খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য ইতিপূর্বে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কোনো ভাষাতেই রচিত হয় নি”^{১০}

সৈয়দ মুজতবা আলীর চতুরঙ্গ প্রবন্ধসংকলনের অন্তর্গত ‘শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস’ প্রবন্ধে মূল আলোচ্য বিষয় হল— রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন ও তার সার্বজনীন মানবতাবোধ। মুজতবা আলী রামকৃষ্ণকে কেবল একজন ধর্মগুরু বা সাধক হিসেবে দেখেননি; তিনি তাঁকে এক সার্বজনীন সত্যসন্ধানী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। রামকৃষ্ণ নিজের সাধনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মপথ পরীক্ষা করেছিলেন— হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম— সবখানেই তিনি একই সত্য ও ভগবানের একাত্ম অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বলেছিলেন, “যতো মত, ততো পথ”— অর্থাৎ সব ধর্মই একই চূড়ান্ত সত্যের দিকে নিয়ে যায়।

প্রবন্ধে মুজতবা আলী বিশেষভাবে দেখিয়েছেন যে, রামকৃষ্ণের মূল শিক্ষা ছিল ভক্তি, প্রেম ও সহিষ্ণুতা। তিনি ধর্মকে সংকীর্ণ আচারবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি, বরং মানুষের আত্মিক মুক্তি ও মিলনের পথে উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁর জীবনের সরলতা ও নিরহংকার ভাব আধ্যাত্মিক শক্তিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছিল। অতএব, এই প্রবন্ধের মূল বিষয় হল রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন ও সাধনার মাধ্যমে প্রকাশিত ধর্মের সার্বজনীনতা, ভক্তি ও প্রেমময় মানবতাবাদ, যা সৈয়দ মুজতবা আলীর চোখে আধুনিক যুগেও এক শাস্ত্রত শিক্ষা হয়ে আছে, -

“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমার নেই। এ কথা স্বীকার করেও যদি দম্ভভরে কিছু বলি, তবে বলবো, যে সাধক গীতোক্ত কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয় করতে পেরেছেন তিনি সমগ্র পুরুষ-পরম পুরুষ। কোনো মহাপুরুষকে যদি দম্ভভরে যাচাই করতে চাই, তবে এই তিনটির সমন্বয়েই সন্ধান করবো। তার কারণ গীতাতে এই তিন পন্থা উল্লিখিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত অন্য কোন চতুর্থ পন্থা আবিস্কৃত হয় নি। এ তিন পন্থার সমন্বয়কারী শ্রীকৃষ্ণের সহচর। তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।”^{১১}

বস্তুত, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কেবল আচারধর্মী নয়; তিনি সেখান থেকে মানবিকতা, সহিষ্ণুতা ও আন্তরিকতার রূপটিই গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন। মুজতবা আলীর ধর্মীয় উদারতার এক প্রকৃষ্ট চিত্র আমরা তাঁর ‘শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস’ প্রবন্ধে লক্ষণীয়।

সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘ধর্ম’ প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত মূল বক্তব্য হচ্ছে, সময়ের সঙ্গে ধর্মের ভূমিকা ও কার্যকারিতা নিয়ে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের ভূমিকা ও প্রভাবও বদলে গেছে। এক সময় মানুষের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মই ছিল প্রধান নিয়ামক; দৈনন্দিন স্নান, খাদ্যাভ্যাস, দান-ধ্যান থেকে শুরু করে সামাজিক দায়িত্ব পর্যন্ত সবই ধর্মীয় নির্দেশনার অধীন ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে সেই স্থান দখল করেছে চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি ও পৌর শাসন-প্রশাসন। বর্তমানে কী খাওয়া উচিত বা উচিত নয়— এসব বিষয়ে নির্দেশ দেন চিকিৎসকরা। ফলে ধর্মের পুণ্য-পাপের ধারণা এখন অনেকটাই বাস্তবভিত্তিক সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার হাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।

উক্ত প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, একসময় উৎসব বা দান-ধ্যানের মাধ্যমে গ্রামের কুটিরশিল্প, কৃষক বা মজুররা অর্থনৈতিক সুবিধা পেত। ফলে সমাজে একধরনের ইতিবাচক চক্র সৃষ্টি হত।

“দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমা নির্মাণ থেকে আরম্ভ করে জমিদারকে অন্ন, বস্ত্র, ছত্র, তৈজসাদি, পাদুকা, খট্ট, অলঙ্কার-দুনিয়ার কুঞ্জে জিনিস দান করতে হত। এতে করে চাষা, জোলা, ছাতাবানানেওলা, কাঁসারি,

কামার, মুচি, মিস্ত্রি-বস্ত্রত গ্রামের যাবতীয় কুটিরশিল্প এক ধাক্কায় বহু-বিস্তার বিক্রি করে রীতিমত সচ্ছল হয়ে যেত। শুধু তাই নয়, কাঁসারি দু পয়সা পেত বলে সে ছাতা কিনত, ছাতাওয়ালার চার পয়সা হল বলে সে শাঁখা কিনত-ইত্যাদি ইত্যাদি, আদ্য ইনফিনিটুম।”^{১২}

কিন্তু আধুনিক যুগে সেই দান-ধ্যান শিল্পপতিদের বা বিদেশি পণ্যের পক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, গ্রামের অর্থনীতিকে আর বাঁচাতে পারছে না। পুঁজিবাদ আজ ধর্মের ব্যবসা করছে। ফলে ধর্মের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ভূমিকা আজ অনেকখানি বিলুপ্ত।

সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্যকর্মে ধর্মীয় সংকীর্ণতার কোনো প্রকাশ নেই। বিভিন্ন ধর্মসম্পর্কে তাঁর গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞানের ফলেই তিনি এক সর্বজনীন ও উদার মানসিকতার অধিকারী হয়েছিলেন। বিশেষ করে ‘ধর্ম ও কমিউনিজম’ প্রবন্ধে তাঁর ধর্মবোধের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তা সত্যিই অনন্য ও অভিনব, -

“যখনই হিন্দুরা তারস্বরে চিংকার করেন, ‘ধর্ম গেল’, ‘ধর্ম গেল’, কিংবা মুসলমানরা জিগির তোলেন ‘ইসলাম ইন ডেনজার’, তখন অধর্মের নিবেদন, পৃথিবীর তাবৎ হিন্দু লোপ পেলেও হিন্দুধর্মের এতটুকু সত্য বিনষ্ট হবে না, তাবৎ মুসলমান মারা গেলেও শব্দার্থে লুপ্ত হবেন না। ‘ইসলামে’র শব্দার্থ, ‘সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করা।’ শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে সর্বধর্ম ত্যাগ করে তাঁরই শরণ নিতে আদেশ করছেন, তখন ঐ অর্থই করেছেন। ‘সর্বধর্ম’ বলতে আজকের দিনে আমরা বুঝি different ideals, different values। আমাদের ভুল বিশ্বাস, ভিন্ন ভিন্ন ‘আদর্শ’ বুঝি একে অন্যকে contradict করে ও সবাই সত্য। তা নয়। সত্য এক। সত্যে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। তাই বিদ্যাপতির ভাষায় কৃষ্ণলাভ করে শ্রীরাধা বললেন, ‘দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দ্ব’।”^{১৩}

মুজতবা আলীর সাহিত্যে কোন ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছিল না। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায় যে, গোঁড়া মুসলিম সমাজের সঙ্গে তাঁর একটি বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এই বিভেদ তার মানসিকতাকে নষ্ট করতে পারেনি। কারণ, তিনি ধর্মের অন্ধ ভক্ত না হয়ে ধর্মের অন্ধতা নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন। ধর্মমূলক রচনার ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি যেমন নিজের জন্মলব্ধ ধর্মকে সর্বোচ্চ বলে দাবি করেননি, তেমনি তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে অন্যান্য ধর্মের উপরেও আঘাত হানেননি। এখানে মুজতবা সম্পর্কে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের মন্তব্যটি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে-

“মুজতবা আলী ঈশ্বর বিশ্বাসী খাটি মুসলমান ছিলেন। কিন্তু বহু শাস্ত্র পৃথিবীর প্রায় তাবৎ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে অনায়াসে সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামীর উর্ধ্বে উঠতে পেরে ছিলেন। তাঁর প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস ও অসম্প্রদায়িকতা অথবা বলা উচিত উদারদৃষ্টি ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষতা - তাঁর রচনার মধ্যে পাশাপাশি চলেছে বরাবর। এতটা কেউ ভেবে চিন্তে হিসেব করে লিখতে পারে”^{১৪}

ছাত্র জীবন থেকেই তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি এই বিষয়ে অধ্যাপনাও করেছিলেন, তাই খ্রীষ্টান, হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, ইহুদি সকল ধর্মতত্ত্বে থেকেই তিনি জীবনের নানা উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে কোথাও রক্ষণশীল কোনো অন্ধত্ব লক্ষ করা যায়নি। বরং সর্বত্রই একটা সমন্বয়ের ভাবই পরিলক্ষিত হয়েছে।

আমরা জানি, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ছিল মুজতবা আলীর অন্যতম প্রিয় চিন্তার ক্ষেত্র। তিনি এই বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন ও পাঠদান করেছেন এবং মুক্ত মনের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনাও অংশ নিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সর্বদা উন্মুক্ত ও পক্ষপাতহীন। ‘গীতা-রহস্য’, ‘বড়দিন’, ‘বুদ্ধ শরণং’, ‘ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা’, ‘বঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতি’, ‘খৃষ্ট’ প্রভৃতি রচনায় তাঁর ধর্মবিষয়ক চিন্তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গজেন্দ্রকুমার মিত্র উল্লেখ করেছেন যে, মুজতবা আলী একান্তভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী মুসলমান হলেও তিনি বহুবিধ ধর্মগ্রন্থের অধ্যয়নের ফলে সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামি থেকে সহজেই মুক্ত হতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অসাম্প্রদায়িকতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় তাঁর লেখায় সমান্তরালভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো কেবল হিসেবি বা কৃত্রিমভাবে সাজানো কোনো বক্তব্য নয়, বরং অন্তরের সহজ সত্য হিসেবেই ফুটে উঠেছে। বর্তমান সময়ে, যখন সমাজ নানা সংকট ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মুখোমুখি, ধর্ম ও রাজনীতির গোলমাল পরিলক্ষিত হয়, তখন মুজতবা আলীর ধর্মবোধ ও চিন্তার সঠিক উপলব্ধি আমাদের জন্য এক কার্যকর পথনির্দেশ হতে পারে। কেননা তিনি ‘ধর্ম শরণং’ প্রবন্ধে বলেছেন, -

“ধর্ম রাজনীতিতে প্রবেশ করবে কিনা, করা উচিত কিনা সে বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমি কিছু বলতে চাইনে। কারণ আমার মতের কোনো মূল্য নেই। আমি শুধু এইটুকু দেখিয়েই সন্তুষ্ট যে ধর্মকে ‘গেট আউট’ বললেই সে সুড়সুড় করে বেরিয়ে যায় না। এবং তাই যদি সত্য হয় তবে ধর্মকে কি প্রকারে জনপদ-কল্যাণে নিযুক্ত করা যায় সেইটে সাদা চোখে ভালো করে তলিয়ে দেখতে হবে। এবং তলিয়ে দেখতে হলে ঈশ্বর ধর্মচর্চার প্রয়োজন। সেটা কি প্রকারে করা যায় সেই হল সমস্যা। ‘ধর্ম’ বলতেই যাঁরা অজ্ঞান তাঁদের হাতে তো আর সব কিছু ছেড়ে দেওয়া যায় না।”^{১৫}

‘পঞ্চতন্ত্রের’ অন্তর্গত ‘নেতাজি’ প্রবন্ধের মুখ্য বক্তব্য হল, ক্ষুদ্রতর স্বার্থ ত্যাগ করতে না পারলে বৃহত্তর আদর্শের সম্মুখীন হওয়া যায় না। এক্ষেত্রে লেখক নেতাজির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আদর্শকেই তুলে ধরেছেন। লেখকের মতে স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান-শিখ সকলকেই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ শূন্য হয়ে একজোটে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই দেশে স্বরাজ আনা সম্ভব হবে। এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে তিনি ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’ গঠন করলেন। শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষাই তার উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁর মধ্যে ছিল একটা ভিন্নতর আদর্শ।

উপসংহার : মুজতবা আলীর ধর্মচিন্তার মূল লক্ষ্য ছিল মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখা, ধর্মকে মানবতার সেবায় নিয়োজিত করা। তাই তিনি কখনও ধর্মীয় কট্টরতা বা গোঁড়ামিকে সমর্থন করেননি। বরং সর্বধর্মের মধ্যে যে মানবতাবোধ নিহিত রয়েছে, তা তিনি তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ‘গীতা রহস্য’ বা ‘বুদ্ধ শরণ’ প্রবন্ধে তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের গভীরতম সত্যকে ব্যাখ্যা করেছেন সাধারণ পাঠকের বোধগম্য ভাষায়। আবার ‘বড়দিন’ প্রবন্ধে খ্রিস্টধর্মের মূল বাণীকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। এভাবেই তিনি ধর্মকে কেবল একটি সম্প্রদায়ভিত্তিক ব্যবস্থা নয়, বরং মানবজীবনের এক অভিন্ন মূল্যবোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাঁর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি। বিদেশ ভ্রমণ, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ধর্মের সংস্পর্শ তাঁকে সমৃদ্ধ করেছিল। ফলে তাঁর ধর্ম ভাবনা কোনও একক জাতি বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ থাকেনি। তিনি বিশ্বজনীন মানবতার আলোয় ধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর এই মননশীলতা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ বর্তমান সময়ে যখন ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সংঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন মুজতবা আলীর মত উদার ও মানবতাবাদী ধর্ম ভাবনা আমাদের পথ প্রদর্শন করতে পারে।

সুতরাং বলা যায়, সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধ সাহিত্য বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে এক অভিনব মাত্রা যোগ করেছে। ধর্ম ভাবনার আলোকে তাঁর রচনা কেবল অতীত নয়, সমসাময়িক সমাজের জন্যও এক অমূল্য শিক্ষার ভান্ডার। তিনি দেখিয়েছেন ধর্ম মানে আচার নয়, গোঁড়ামি নয়; ধর্ম মানে মানবতার সেবা, সাম্যের শিক্ষা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও বিশ্বজনীনতা। অতএব বলা যায়, সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধ সাহিত্যে ধর্ম ভাবনা এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে, যেখানে সাহিত্য, দর্শন ও মানবতাবাদ এক অভিন্ন অন্তর্লীন চোরাস্রোতে মিলিত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যের এই ধর্ম ভাবনা কেবল বাংলা সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেনি, বরং আমাদের সমগ্র মানব সমাজকেই নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছেন - ধর্ম মানে বিভাজন নয়, ধর্ম মানে মিলন, সাম্য ও মানবতা।

Reference:

১. আলী, সৈয়দ মুজতবা, *সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলি-০৩*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৮১, পৃ. ভূমিকা অংশ, দ্রঃ।
২. তদেব, পৃ. ভূমিকা অংশ, দ্রঃ।
৩. আলী, সৈয়দ মুজতবা, *সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলি-০২*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৮১, পৃ. ৪২
৪. তদেব, পৃ. ১৪২
৫. তদেব, পৃ. ১৪২

৬. তদেব, পৃ. ১৪৪
৭. তদেব, পৃ. ১৪৫
৮. আলী, সৈয়দ মুজতবা, *সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলি-০৩*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৯. তদেব, পৃ. ৭৩
১০. তদেব, পৃ. ২১০
১১. তদেব, পৃ. ২৬০
১২. আলী, সৈয়দ মুজতবা, *সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলি-০৩*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৮১, পৃ. ১৬২
১৩. তদেব, পৃ. ১৬৭
১৪. জুলফিকার, এন, *সৈয়দ মুজতবা আলী স্মৃতি-সত্তা-সাহিত্য*, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর ২০২১, পৃ. ৩০৫
১৫. আলী, সৈয়দ মুজতবা, *সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলি-০৯*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৫, পৃ. ৩০১-৩০২